‘দ্য ড্যান্স অব রিয়েলিটি: অ্যা
সাইকোম্যাজিক্যাল অটোবায়োগ্রাফি’

হোদোরোস্কির আত্মজীবনী

মূল
আলেহান্দ্রো হোদোরোস্কি

অনুবাদ
রুদ্র আরিফ

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

আর্দ্র নির্ভয়

পুত্র

সূ চি প ত্র

ভূমিকা

কামারশালার অগ্নি থেকে বরফযুগের হারেমে বিস্তৃত
যে জীবন :: ৯

দ্য ড্যান্স অব রিয়েলিটি

অধ্যায় ১ : প্রিয় শৈশব :: ১৫

অধ্যায় ২ : অন্ধকারের দিনগুলো :: ৫৫

অধ্যায় ৩ : প্রথম পদক্ষেপ :: ৯৩

অধ্যায় ৪ : কাব্যকর্ম :: ১২৩

অধ্যায় ৫ : মঞ্চধর্ম :: ১৭৭

অধ্যায় ৬ : অনিঃশেষ খোয়াব :: ২৫৭

অধ্যায় ৭ : জাদুকর, গুরু, ওঝা, বৈদ্য :: ৩০৯

অধ্যায় ৮ : ম্যাজিক থেকে সাইকোম্যাজিক :: ৩৯৩

অধ্যায় ৯ : সাইকোম্যাজিক থেকে সাইকোশামানিজম :: ৪৫১

বিবিধ

ফিল্মোগ্রাফি :: ৪৯৮

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি :: ৫০৪

পরিচয় পর্ব :: ৫০৬

কামারশালার অগ্নি থেকে বরফযুগের হারেমে বিস্তৃত যে জীবন

যেন কামারশালার গনগনে আগুনের ভেতর পুড়ে লাল লৌহখণ্ডকে আচ্ছামতো পিটিয়ে, একেবার একেক গড়ন দিয়ে, ছুড়ে ফেলে দেওয়া বরফযুগের প্রাগৈতিহাসিক হারেমে! অগুনতি দেহস্পর্শে জীবনকে উষ্ণ করে নেওয়ার প্রচেষ্টা। তারপর নতুন গড়ন নিয়ে আবারও ফিরে আসা অন্য কোনো কালের কোনো কামারশালায়। অন্য কোনো নিরন্তর পিটুনিতে পুরনো গড়ন হারিয়ে, নতুন গড়নে অগ্নিভাস্কর্য থেকে হিমশীতল কাঠামোয় ফিরে ফিরে যাওয়ার এক ব্যাখ্যাতীত, মহাজাগতিক খেলা! জীবনকে এ রকমই বারবার ভাঙতে ভাঙতে বহুমুখীরূপে গড়ে তোলার খেলায় চালিত করেছেন আলেহান্দ্রো হোদোরোস্কি। চিলিয়ান-ফ্রেঞ্চ আভাঁ-গার্দ ফিল্মমেকার। কবি। পাপেটার। সাইকোশামান। আরও কত কত পরিচয় তার! সব মাধ্যমেই রেখেছেন নিজস্ব স্বাক্ষর। অথচ চাইলেই বেশ নির্বিঘ্নে কাটাতে পারতেন সুবিধাপ্রাপ্ত জীবন।

কারও জীবন হতে পারে এত বৈচিত্র্যময়, এত দুর্মর, এত উলট-পালটের ভেতর দিয়ে যাওয়া– তাও অনেকটা স্বেচ্ছাচারীর মতো, আলেহান্দ্রোর জীবনপাঠ সেই অভিজ্ঞতা এনে দেয়। তার আত্মজীবনী তাই শুধু একজন ব্যক্তিবিশেষের জীবনগ্রন্থের ভেতর পরিধি হারায় না; বরং গভীরবোধী জীবন্বেষণের বিবিধ শাখা-প্রশাখাকে উসকে দেয়। শিল্প-সাহিত্যাঙ্গনের এই বিরল প্রতিভাধর কিংবদন্তির দর্শনমুখর আত্মজীবনী 'দ্য ড্যান্স অব রিয়েলিটি: অ্যা সাইকোম্যাজিক্যাল অটোবায়োগ্রাফি' এরই এক দুর্লভ নমুনা। মূল গ্রন্থ সম্ভবত স্প্যানিশ ভাষায় লেখা (সেই উল্লেখ নেই কোথাও যদিও); ইংরেজিতে প্রকাশ পেয়েছে অ্যারিয়েল গডউইনের অনুবাদে। সেই অনুবাদেরই বাংলা ভাষান্তর– 'হোদোরোস্কির আত্মজীবনী'।

২.

এ গ্রন্থের অনুবাদ ঠিক কবে শুরু করেছিলাম, মনে নেই! অভ্যাসবশত একটানা কিছুদিন করে, তারপর আবার অনির্দিষ্টকালের বিরতি। এভাবে বেশ লম্বা একটি সময়ই লেগে গেল। তারপর পরিমার্জন ও সংযোজন-বিয়োজনেও কেটে গেল দীর্ঘ সময়। চেষ্টা ছিল ভাষা যথাসম্ভব প্রাঞ্জল এবং স্থান-চরিত্রের নাম সেগুলোর মূল ভাষামতে নির্ভুল রাখার। তবু হয়তো কিছু ভুল-ভ্রান্তি রয়েই গেল, অজান্তে অথবা দৃষ্টি এড়িয়ে। সে জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

বলে রাখা ভালো, নিজ উদ্ভাবিত সাইকোম্যাজিক্যাল অ্যাক্টের পরামর্শ এখনো দিয়ে যাচ্ছেন নব্বই পেরোনো আলেহান্দ্রো হোদোরোস্কি। এই গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণের শেষ দিকে 'পরিশিষ্ট' বিভাগে সেইসব পরামর্শের কিছু নমুনা দেওয়া ছিল; সেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় এখানে রাখলাম না। কেননা, মূল আত্মজীবনীতেই ছড়িয়ে রয়েছে এ রকম বেশ কিছু নমুনা; তা-ও বিশদভাবে। তাই এমনিতেই ফুলে-ফেঁপে ওঠা এ গ্রন্থের মেদ একটু ঝেড়ে নিতেই বাদ দেওয়া হলো সেগুলো। তাতে গ্রন্থটির প্রকৃত আবেদন এতটুকুও কমবে না বলেই বিশ্বাস।

ভূমিকা অংশে এই ফিল্মমেকার সম্পর্কে একটি বিশদ গদ্য হয়তো জুড়ে দেওয়া যেত। কিন্তু তার প্রয়োজন মনে করিনি, যেখানে আস্ত একটি আত্মজীবনী হাজির, সেখানে ওইসব কথামালার পক্ষে বাহুল্য হয়ে ওঠার শঙ্কা থাকায়।

বাস্তবতার ময়দানে অবাস্তব, অতিবাস্তব, পরাবাস্তব, জাদুবাস্তব, মহাজাগতিক দর্শন... এককথায়, অগুনতি গভীর ধ্যানি বিষয়আশয় জুড়ে দেওয়ার নিপুণ কারিগর আলেহান্দ্রো হোদোরোস্কির আত্মজীবনীতে, প্রিয় পাঠক, আপনাকে স্বাগত...

রুদ্র আরিফ
২৬ নভেম্বর ২০২৩
ঢাকা, বাংলাদেশ

দ্য
ড্যান্স অব
রিয়েলিটি

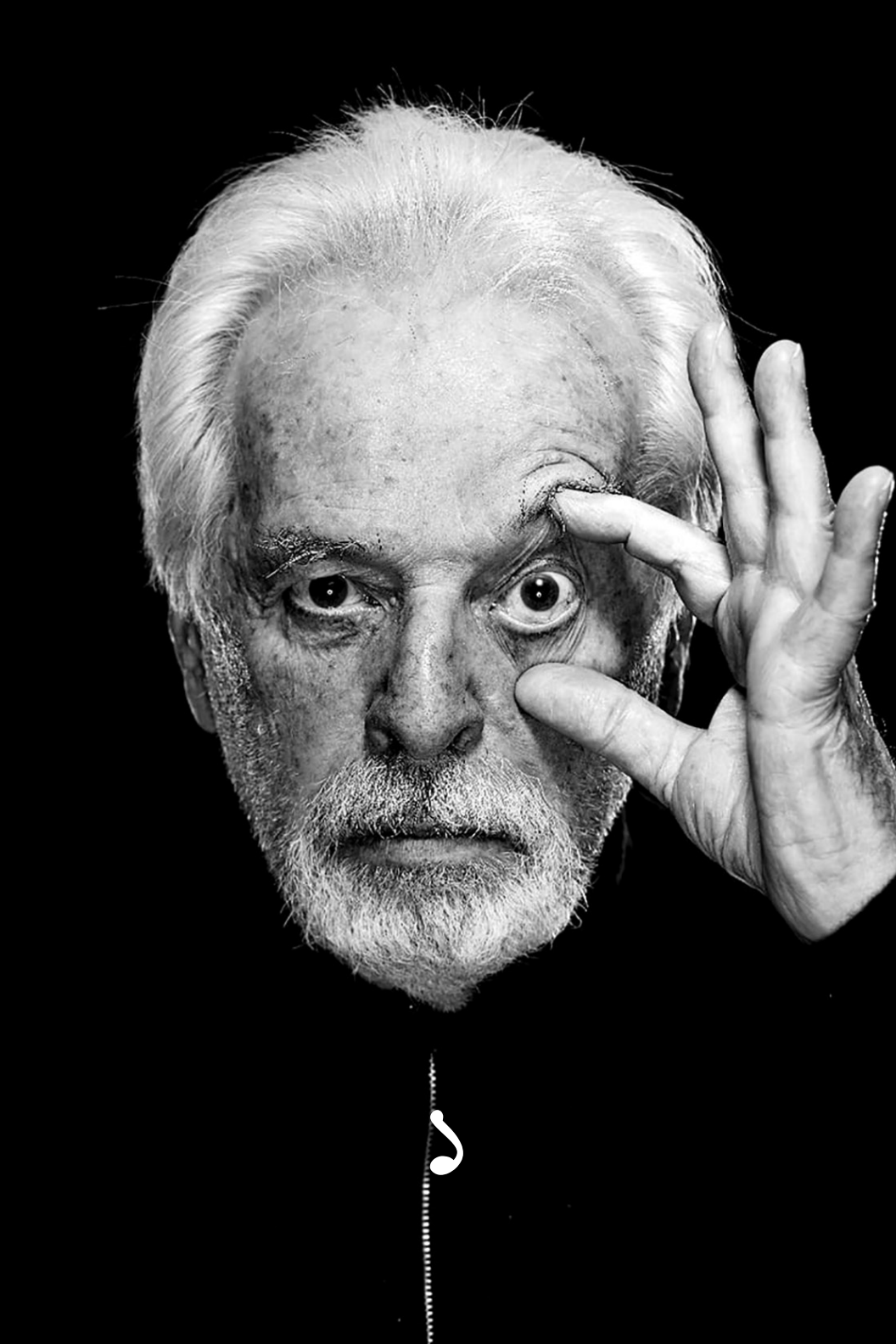

প্রিয় শৈশব

আলেহান্দ্রো
হোদোরোস্কি,
ছয় মাস বয়সে

আমার জন্ম ১৯২৯ সালে। চিলির উত্তরাঞ্চলে। পেরু ও বলিভিয়ার কাছ থেকে জয় করে নেওয়া এক তল্লাটে। আমার জন্মস্থানের নাম তকোপিইয়া। ছোট্ট এক বন্দরনগর। টুয়েন্টি সেকেন্ড প্যারালালে। আর তা হয়তো ঘটনাচক্রে নয়।

ট্যারো অব মার্সেলির* ২২ আরকানা বা গুপ্তরহস্যের প্রতিটিই দুই বর্গক্ষেত্রের এক আয়তক্ষেত্রে আঁকা। ওপরের বর্গক্ষেত্র সম্ভবত স্বর্গের, আত্মিক জীবনের প্রতীক। নিচের বর্গটি সম্ভবত প্রতীক– পৃথিবীর, বস্তুগত জীবনের। এই আয়তক্ষেত্রের কেন্দ্রে যে তৃতীয় বর্গক্ষেত্রটি অঙ্কিত রয়েছে, সেটি মানুষের, অন্ধকার ও আলোর মধ্যকার মিলনের প্রতীক হয়ে ওপরেরটিকে ধারণ করে নিচেরটিতে সক্রিয় হয়। এই প্রতীকীবাদের খোঁজ মেলে চীন ও মিসরের প্রাগৈতিহাসিক মিথগুলোতে (আকাশমাতা নুতের কাছ থেকে পার্থিবপিতা গেবের আলাদা হয়ে ঈশ্বর শু'র, 'শূন্য সত্তা' হয়ে ওঠার ভেতর); চিলীয় নেটিভ মাপুচে** পুরাণেও এর মেলে দেখা: 'সৃষ্টির শুরুতে আকাশ ও মাটি এতই কাছাকাছি ছিল, এ দুটোর মধ্যে ততদিন পর্যন্ত কোনো ফাঁকা ছিল না, যতক্ষণ না চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটল– যেটি আকাশকে উঁচুতে নিয়ে মানবসভ্যতাকে মুক্ত করেছিল।' অন্যভাবে বললে, পশুকুল ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য প্রতিষ্ঠাকরণ।

কুয়েচুয়াদের*** আন্দিয়ান ভাষায় 'তকো' মানে 'দ্বিগুণ পবিত্র বর্গক্ষেত্র', আর 'পিইয়া' মানে 'শয়তান'। এ ক্ষেত্রে শয়তান মানে মন্দের অবতার নয়, বরং এমন এক সত্তার অন্তর্ভৌম মাত্রা– যেটি আত্মা ও বস্তু– উভয় মিলে তৈরি একটি জানালা। অর্থাৎ মানবদেহের ভেতর দিয়ে দৃষ্টি মেলে দেয় দুনিয়া দেখার এবং দুনিয়ার সঙ্গে নিজের জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার জন্য। মাপুচে অনুসারে, 'পিইয়ান' মানে 'আত্মা, মানবাত্মার নিজ চূড়ান্ত গন্তব্যে পদার্পণ।'

***

ক্ষণে ক্ষণে অবাক হয়ে ভাবি, টুয়েন্টি-সেকেন্ড প্যারালালে, চৈতন্যের আবির্ভাব হওয়ার জানালা– 'দ্বিগুণ পবিত্র বর্গক্ষেত্র' নামের একটি জায়গায় জন্ম নেওয়ার

** ট্যারো তাসের স্ট্যান্ডার্ড প্যাটার্নবিশেষ*

*** লাতিন আমেরিকান আদিবাসী গোষ্ঠী*

**** লাতিন আমেরিকান সেইসব আদিবাসী গোষ্ঠী, যাদের ভাষা কুয়েচুয়া*

প্রভাব আমাকে নিজের জীবনে 'ট্যারো'কে এত বেশি ধারণ করার কারণ; নাকি ষাট বছর পর নিজে যা করেছি– অর্থাৎ, ট্যারো অব মার্সেলিকে পুনর্জীবনদান ও সাইকোম্যাজিকের উদ্ভাবন– সেটির জন্য আমি জন্মগতভাবেই নিয়তিনির্দিষ্ট! নিয়তিনির্দিষ্টের কি সত্যি কোনো অস্তিত্ব রয়েছে? আমাদের জীবন কি ব্যক্তিস্বতন্ত্র আগ্রহকে ছাড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যের অভিমুখী হতে পারে না?

সরকারি স্কুলে আমার ভালো শিক্ষকটির নাম ছিল মিস্টার তোরো– এ কি কাকতালীয়? 'তোরো' ও 'ট্যারো'র মধ্যে নিশ্চিতভাবেই মিল রয়েছে। তিনি আমাকে তার তাসের বান্ডিল দেখিয়ে, নিজস্ব ব্যক্তিগত তরিকায় পাঠ দিতেন। সেই তাসগুলোর প্রতিটিতে একটি করে বর্ণ ছাপা ছিল। তিনি আমাকে সেগুলো উলটপালট করতে বলতেন। তারপর সেখান থেকে ইচ্ছেমতো কয়েকটি তাস টেনে নিতে আর তাতে লেখা থাকা বর্ণ ধরে শব্দ বলার চেষ্টা করতে বলতেন। সেই চার বছরেরও কম বয়সী আমি প্রথম যে শব্দটি বলেছিলাম, তাহলো 'ওহো' [OJO; চোখ]। শব্দটি যখন উঁচু গলায় বললাম, আমার মাথার ভেতর আচমকাই কিছু একটা খেলে গেল। ফলে, এক ঝলকেই পড়তে শিখে গেলাম। নিজের কালো মুখে বিরাট হাসি ফুটিয়ে মিস্টার তোরো আমাকে অভিবাদন জানালেন: "তুমি এত তাড়াতাড়ি পড়তে শিখেছ বলে আমি কিন্তু অবাক হইনি। তোমার নামের মধ্যেই একটি 'সোনালি চোখ' [ojo d'oro; ওহো দ'ওরো] রয়েছে।" আর তাসগুলো এভাবে সাজালেন: 'আলেহান্দ্র ওহো দ ওরো স্কি' [alejandr OJO D ORO wsky]। ওই মুহূর্তটি আমার মনে চিরকালের জন্য গেথে রয়েছে। এর প্রথম কারণ, এটি আমাকে সামনে জাহির করা পাঠের স্বর্গোদ্যানের প্রতি নিজের দৃষ্টিশক্তি প্রশস্ত করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এটি আমাকে বাকি পৃথিবীর চেয়ে নিজেকে আলাদাভাবে হাজিরের পথ করে দিয়েছে।

অন্য শিশুদের মতো ছিলাম না আমি। পরিণামে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে একটি উঁচু ক্লাসে জায়গা করে নিয়েছিলাম, যে ছেলেরা আমার শত্রু হয়ে উঠেছিল। কেননা, আমার মতো এত সাবলীলভাবে পড়াশোনা করার দক্ষতা ওদের ছিল না। সবগুলো ছেলেই, যাদের বেশির ভাগই ছিল বেকার খনিশ্রমিকদের সন্তান, (কেননা, ১৯২৯ সালের শেয়ার বাজার পতন ৭০ শতাংশ চিলীয়কে দারিদ্র্যের ভেতর ঠেলে দিয়েছিল;) ওরা ছিল গাঢ় বাদামি চুল ও বোঁচা নাকের। কিন্তু আমি যেহেতু রুশ-ইহুদি অভিবাসী পরিবারের, তাই আমার নাক ছিল লম্বা ও বাঁকানো; চুল একেবারেই ঝলমলে। এ কারণে ওরা আমাকে 'পিনোক্কিও' বলে ডাকত। আর 'মিল্কি লেগ' বা 'দুধেল ঠ্যাং' বলে খেপাত বলে আমি শর্টস পরা ছেড়ে দিয়েছিলাম! আমার চোখের রং সোনালি ছিল বলেই বোধ হয়, বন্ধুর

'দ্য ড্যান্স অব রিয়েলিটি' সিনেমায় হাইমে, ক্যারোট ক্লাউন ও লেটুস ক্লাউন

ভয়ানক অভাব দূর করতে নিজেকে শহরটিতে সদ্য চালু হওয়া লাইব্রেরিতে ডুবিয়ে ফেলেছিলাম। সে সময়ে কোনো বর্গক্ষেত্রকে অতিক্রান্ত করা কম্পাসের দরজার ওপরের প্রতীকচিহ্নে কোনো রকম মনোযোগ দিইনি।

লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করেছিল ফ্রিম্যাসনরি।* সেখানে বেশ ছায়া ছিল। দয়ালু লাইব্রেরিয়ান আমাকে তাক থেকে যেসব বই নামানোর অনুমতি দিতেন,

** একটি গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘবিশেষ। ফ্রিম্যাসনদের দাবি অনুসারে, বর্তমানেও এই সংঘ তথা সমাজের লাখ লাখ সদস্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে বিরাজমান। তবে তাত্ত্বিকদের অনেকের মতেই, প্রকৃত ফ্রিম্যাসনরির স্থায়িত্বকাল ছিল শলোমনের মন্দির নির্মাণের সময়কাল (আনুমানিক ৯৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) থেকে মধ্যযুগে ষোড়শ শতক পর্যন্ত*

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পড়তাম: রূপকথা, অভিযানের কাহিনি, শিশুতোষ ধ্রুপদি, প্রতীকের অভিধান ইত্যাদি। একদিন ওই তাকগুলোতে বই খুঁজতে খুঁজতে সামনে পড়ল একটি হলুদ বই: ইতেইয়ার[২] *দ্য ট্যারোস* [Les Tarots]। পড়ার বৃথাই শত চেষ্টা করলাম। বর্ণগুলো অচেনা লাগছিল। শব্দগুলোও অবোধ্য। কী করে পড়তে হয়, ভুলে গেছি– এই উৎকণ্ঠা পেয়ে বসল আমাকে। মনোবেদনায় ডুবে, এ নিয়ে লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে কথা বলতেই তিনি হেসে ওঠলেন: 'কী করে তুমি বুঝবে এ ভাষা? ওহে ছোট্ট বন্ধু, এটি তো ফরাসি ভাষায় লেখা! আমি নিজেই এ ভাষা জানি না!' তাহলে কী করে এই রহস্যময় পৃষ্ঠাগুলোর মর্মোদ্ধার করব! পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকলাম। কতগুলো নম্বর, কিছু হিসেব, আর বারবার একটি শব্দ– 'থৎ' [Thot; বা, 'বলেন']। আর জ্যামিতিক নকশা চোখে পড়ল। তবে আমাকে সবচেয়ে মনোমুগ্ধ করল একটি আয়তক্ষেত্র। এর ভেতরে তিন-তারকা মুকুট পরা এক রাজকন্যা একটি সিংহাসনে বসে তার পায়ের কাছে মাথা রেখে বিশ্রাম নেওয়া এক সিংহকে স্নেহভরা আদর করছে। ওই প্রাণীর অভিব্যক্তিতে একটি চূড়ান্ত রকমের নম্রতার সমন্বয়ে গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক ভাব ফুটে রয়েছে। কী যে শান্ত এক জন্তু! চিত্রটি এতই ভালো লেগে গেল, আমি একটি পাপ করে বসলাম। সেই পাপের জন্য কখনোই অবশ্য অনুশোচনা করিনি: পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে নিয়ে এলাম বাসায়, নিজের রুমে। তারপর একটি পাটাতনের নিচে লুকিয়ে রাখলাম; যে তাসের 'শক্তি' হয়ে উঠেছিল আমার গোপন ভাণ্ডার। নিজের নিষ্কলুষতার শক্তিতে ওই রাজকন্যার প্রেমে পড়ে গেলাম আমি।

একটি শান্তিপ্রবণ জন্তুর সঙ্গে এই বন্ধুত্ব করার ভাবনা, স্বপ্ন ও কল্পনা আমার এত বেশি ছিল, বাস্তবতা আমাকে এক সত্যিকারের সিংহের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়ে দিল। আমার বাবা, হাইমে[২] নিজের দোকান *কাসা ইউক্রানিয়া* দিয়ে থিতু হওয়ার আগে ছিলেন সার্কাস পারফরমার। তার বিশেষত্ব ছিল ট্রাপিজ স্টান্টগুলোতে; পরবর্তীকালে নিজের চুল বেঁধে ঝুলে থাকায়। তিন শতাব্দী ধরে বৃষ্টি না হওয়া তারাপাকা মরু অঞ্চলের পাহাড় ঘেঁষে গড়ে ওঠা তকোপিইয়া শহরে উষ্ণ শীতকালগুলো ছিল দর্শনীয় যেকোনো কিছুর প্রশ্নেই এক দুর্নিবার আকর্ষণীয় ব্যাপার। সেগুলোর মধ্যে ছিল প্রসিদ্ধ *দ্য হিউম্যান ঈগলস* সার্কাস। বাবা আমাকে ওই সার্কাসে নিয়ে যেতেন। এরপর সেটির পারফরমারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। বাবাকে তারা বেশ ভালোভাবেই চিনতেন। আমি যখন ছয় বছর বয়সী, একদিন দুই ক্লাউন– একজনের মঞ্চনাম লেটুস– সবুজ নাক ও পরচুলা সহকারে সবুজ বেশভূষা; আরেকজনের মঞ্চনাম ক্যারোট– যিনি ছিলেন কমলা রঙের একই বেশভূষায়– তারা মাত্র কয়েক দিন আগে জন্ম নেওয়া একটি সিংহশাবক

তুলে দিলেন আমার কোলে।

ছোট্ট অথচ শক্তিশালী, বিড়ালের চেয়ে ভারী, বড় বড় থাবা, মোটা নাক, কোমল পশম আর অতুলনীয় নিষ্পাপ চোখের একটি সিংহ জড়িয়ে ধরে অপরিমেয় আনন্দ হলো আমার। আমি কাঠের গুঁড়ায় ঢাকা রিংয়ে ওই ছোট্ট প্রাণীকে নিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে খেলতে শুরু করলাম। নিজে যেন হয়ে ওঠলাম স্রেফ আরেকটি সিংহশাবক। ওর জান্তব সত্তা ও প্রাণশক্তি নিজের ভেতর শুষে নিলাম। এরপর যখন রিংয়ের ভেতর ক্রস-লেগড পজিশনে বসলাম, ছোটাছুটি থামিয়ে দিয়ে সিংহশাবকটি আমার পায়ের কাছে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতে থাকল। মনে হলো, যেন সে এখানে অনন্তকাল ধরে রয়েছে। অবশেষে যখন সে চলে গেল, ভেঙে পড়লাম বাঁধভাঙা কান্নায়। না ক্লাউনেরা, না অন্য পারফরমারেরা, না আমার বাবা– কেউই আমাকে শান্ত করতে পারলেন না। হাইমের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন বাড়ি। বাড়ি আসার পরও, আরও কয়েক ঘণ্টা মাতম করে কাঁদলাম।

তারপর একসময় শান্ত হয়ে এলে টের পেলাম, আমার হাতে যেন সিংহশাবকটির বিশাল থাবার মতোই শক্তি! বড় রাস্তা থেকে কয়েক শ মিটার দূরে– সৈকতে ছুটে গেলাম। নিজের ভেতর পশুদের রাজার শক্তি অনুভব করে, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলাম মহাসমুদ্রের প্রতি। আমার পায়ের কাছে ভেঙে পড়ছিল ছোট ছোট ঢেউ। সমুদ্রকে খেপানোর জন্য ঢেউয়ের দিকে নুড়িপাথর ছুড়তে থাকলাম। দশ মিনিটের মতো পাথর ছোড়ার পর, ঢেউগুলো ধীরে ধীরে বড় থেকে আরও বড় হতে থাকল। মনে হলো যেন নীল দৈত্যকে রাগিয়ে তুলেছি। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে পাথর ছোড়া চালিয়েই গেলাম। ঢেউগুলো হিংস্র হয়ে ওঠতে শুরু করল। কিছু কিছু ঢেউ ছিল অতিকায়। তারপর আচমকাই কেউ একজন হাত ধরে টান দিল আমাকে: 'থামো, বেকুব বাচ্চা!' এক ছিন্নমূল নারী, যিনি আবর্জনা স্তূপের পাশে বসবাস করেন। লোকে তাকে 'কাপের রানি' বলে ডাকে, ঠিক যেন ট্যারো তাসের মতো। কেননা, তাকে প্রায়সময়ই মাথায় একটি মরচে ধরা পিতলের মুকুট পরে, মাতাল হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। 'আগুনের একটি ছোট্ট শিখা পুরো বন জ্বালিয়ে দিতে পারে; আর একটি পাথরের কাছে প্রাণ যেতে পারে সব মাছের!'

তার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়াতে বেশ বেগ পেতে হলো। আমার সেই কাল্পনিক রাজসিংহাসন থেকে তার দিকে ঘৃণাভরে চিৎকার ছুড়ে দিলাম: 'আমাকে যেতে দাও, নোংরা বুড়ি! আমাকে ছেড়ে দাও, না-হয় তোমাকেও পাথর মারব!' চমকে উঠে কোঁকড়ালেন তিনি। এরপর কাপের রানি যখন সমুদ্রের দিকে